• **প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও হোমরুল আন্দোলন :** স্বদেশি আন্দোলনের পরবর্তী এক দশকের একটি বিশেষ প্রবণতা হল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে জাতীয় আন্দোলনের গতি পরিবর্তন। ইউরোপে বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব পড়েছে ভারতীয় রাজনীতিতে। মডারেটরা এই পর্বে ব্রিটিশ বিরোধিতার নীতি ত্যাগ করে সরকারকে সাহায্য করার দুটি ব্যবস্থা নিয়েছে—(১) তহবিল গঠন এবং (২) সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্য সরবরাহের নীতি। মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে তুষ্ট করা। ব্রিটিশ সরকার তার যুদ্ধে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য হিসাবে গণতন্ত্রকে রক্ষার যুক্তি সাজিয়েছে। যুদ্ধের পর সরকারি সংস্কারের প্রস্তাব তাদের পক্ষে লাভজনক হবে এই আশায় কংগ্রেস সরকারকে সমর্থন করার প্রস্তাব নিয়েছে। এই পর্বে তিলকও তাঁর পূর্বের অবস্থান বদলেছেন। বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেবার বাসনায় তিনি ব্রিটিশ সরকারের সংস্কারের নীতিকে সমর্থন জানালেন। কংগ্রেসের মডারেট নেতৃত্বকেও তিনি আঘাত করতে চাইলেন না। চরমপন্থা ও নরমপন্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রেখে চলা এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে সংস্কার আদায় করার জন্য জাতীয় আন্দোলনকে ভিন্ন পথে পরিচালনা করতে চাইলেন তিনি। তাঁর এই প্রস্তাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলেন অ্যানি বেসান্ত। জাতীয় আন্দোলনকে নতুন গতি দিতে বেসান্ত কংগ্রেসে যোগ দিলেন। গঠিত হল *হোমরুল লিগ* (Home Rule League, 1916)। তিলকও হোমরুল লিগ চাইছিলেন। কংগ্রেসের উচ্চনেতৃত্ব (গোখলে বা ফিরোজ শাহ মেহতা) হোমরুলের প্রশ্নে বেসান্ত বা তিলকের প্রস্তাবে একমত হননি। তিলক চরমপন্থীদের সর্বভারতীয় আন্দোলনে যুক্ত করলেও কংগ্রেসের মধ্যে তেমন সাড়া পেলেন না। বেলগাঁও-এ ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে ব্যাপতিস্টা, কেলকার প্রমুখকে সামনে রেখে তিনি হোমরুল লিগ প্রতিষ্ঠা করলেও অ্যানি বেসান্ত চাইছিলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বেই লিগ স্থাপিত হোক। *দিব্যজ্ঞান সমাজের* (Theosophical Society) সভানেতৃ বেসান্ত কংগ্রেসে যোগ দিয়ে মডারেট ও চরমপন্থীদের একই বৃত্তে এনে ভারতের জন্য আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের ধাঁচে রাজনৈতিক সংস্কার আনার প্রচেষ্টা চালালেন। তাঁর প্রচেষ্টা কাজে এল না। মাদ্রাজে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত হল বেসান্তের *হোমরুল লিগ*। তিলক ও বেসান্তের নেতৃত্বে দুটি *হোমরুল লিগ* গঠিত হল। বেসান্তের *New India*, তিলকের *Young India* স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে প্রচার চালালেও, নিজ নিজ প্রভাবের বৃত্ত গড়ে তুললেও, জাতীয় আন্দোলন এবং সর্বোপরি ইংরেজ বিরোধিতার সংগ্রাম হিসাবে বেসান্ত বা তিলক কেউই হোমরুল লিগকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। **ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল :**

- ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের অভাব। হোমরুল নিয়েও উদার ও চরম পন্থার মধ্যে মতভেদ ছিল। দুই পক্ষই নিজ নিজ শাখা-সংগঠন, সমর্থন জোগাতে চাইলেও, কোনো পক্ষেরই সাংগঠনিক সমন্বয় গড়ে ওঠেনি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে ব্রিটিশ সরকার হোমরুল আন্দোলনের পেছনে তিলক বা অ্যানি বেসান্তের প্রকৃত কর্মসূচি কী, সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে তারা কী অবস্থান নিতে চলেছে এ বিষয়ে কোনো ধারণা করতে পারেনি। স্বভাবতই আন্দোলন সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব কী হবে তা ঠিক করা সম্ভব হয়নি। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে দেশের চেয়ে বিদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সরকারের ভাবনা ছিল বেশি।
- প্রশ্ন উঠেছিল, তিলক বা বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনের দুই শরিক কেউ কারও কাছাকাছি আসতে পারেননি এবং কংগ্রেসের মধ্যে থেকে এই আন্দোলনের উদ্দীপনা ছড়াতে পারেননি। কংগ্রেসও হোমরুল আন্দোলন নিয়ে এক ধরনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়েছে।

- হোমরুল আন্দোলন সাংবিধানিক আন্দোলনের অতিরিক্ত কিছু হয়ে উঠতে পারেনি। ডমিনিয়নের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের এই দাবি যুদ্ধের পরিস্থিতিতে বা যুদ্ধ শেষ হবার পরেও ব্রিটিশ সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, কিছু সংস্কারকে সামনে রেখে ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারী পক্ষের সঙ্গে আপসে যাবে এরকম একটা ভুল ধারণা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের মাথায় এল কেন এ প্রশ্ন নানা মহলেই উঠেছে।
- হোমরুল আন্দোলনের যুগে বহির্বিশ্বের সংকট ব্রিটিশ সরকারকে দেশে নমনীয় নীতি গ্রহণে বাধ্য করবে— এরকম একটা অস্পষ্ট ধারণা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বকে প্রভাবিত করলেও ব্রিটিশ সরকার কিন্তু সুনিশ্চিত হয়েছে যে বঙ্গভঙ্গের প্রত্যাহার ও উদ্ভূত নতুন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস তার প্রাসঙ্গিকতা অনেকটাই হারিয়েছে। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন ও রাজনীতির ক্ষেত্রেও একটা শূন্যতা গ্রাস করেছে। জাতীয় আন্দোলনকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার পন্থা হিসাবে আয়ারল্যান্ডের আন্দোলনের ধাঁচে এদেশে স্বায়ত্তশাসনের এক সাংবিধানিক আন্দোলনকে ফিরিয়ে আনা দরকার ভেবেই হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা বেসান্ত ভেবেছিলেন। তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহশক্তিকে (spirit) ফিরিয়ে আনা। সারা ভারতেই আন্দোলনের দুটি পৃথক ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে (তিলক মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, মধ্যপ্রদেশ, বেরার অঞ্চলে এবং বেসান্ত ভারতের অন্যান্য প্রদেশে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে জনমত গঠনে সক্ষম হয়েছেন, তিলক কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে), অথচ কংগ্রেস হোমরুল নিয়ে কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করেনি।
- ঐতিহাসিক লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিলক, বিপিন পাল, খাপার্দে এবং অন্যান্য জাতীয়তবাদী নেতাদের যোগদান, কংগ্রেসের আবার ঐক্যবদ্ধ হওয়া, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ বিরোধী কোনো আন্দোলন হয়নি, অথচ যুদ্ধের পরিস্থিতিতে অস্ত্র আইন, সংবাদপত্র আইনের প্রশ্নে সরকার ছিল অনমনীয়।
- ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভানেত্রী নির্বাচিত হলেও অ্যানি বেসান্ত তাঁর বিগত চার বছরের হোমরুল আন্দোলন সম্পর্কে কংগ্রেস থেকে কোনো সাড়াই পেলেন না। অথচ চরমপন্থীদের প্রাধান্য সত্ত্বেও কংগ্রেস রাজানুগত্যের প্রশ্নে অটল থেকেছে এবং সব রকম সমস্যা, সংকট বা ব্যয়ের প্রশ্নে সরকারের পাশে থাকার প্রস্তাব নিয়েছে। রাওলাট কমিটি, অস্ত্র আইন, সংবাদপত্র আইন নিয়ে সরকারের অবস্থানের নিন্দা করলেও, কংগ্রেস স্ব-শাসন নিয়ে কোনো প্রস্তাব পাশ করাতে পারেনি। তবে এই অধিবেশনেই হোমরুল প্রস্তাব গ্রহণ করার সময়সীমা ধার্য করে ভারতে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কংগ্রেসকে তৎপর হবার আবেদন রাখা হল।[১]

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ ঘটনাবহুল বছর। সরকার যে দেশের জাতীয় ও বিপ্লবী আন্দোলনকে দমন করতে চাইছে এবং এ প্রশ্নে মডারেটদের প্রভাবিত করতে নতুন কোনো কৌশল অবলম্বন করতে চাইছে সেটা বোঝা গেল এডউইন মন্টাগুর (Edwin Montague) ভারত সচিব হিসেবে এদেশে আগমনকে কেন্দ্র করে। বেসান্ত কংগ্রেসের জন্য অপেক্ষা না করে দেশের সর্বত্র হোমরুল লিগ গঠন ও তাকে কার্যকর করার স্বাধীন প্রস্তাব নিলেন। রাজশক্তি কিন্তু শাসনতান্ত্রিক সুবিধা বিতরণের চেয়ে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা নিতেই তৎপর হল। লক্ষণীয় বেসান্তের হোমরুল লিগের সঙ্গে রামস্বামী আয়ার, জিন্না প্রমুখের সমর্থন জুটে গেল। তাঁর *New India* পত্রিকার জন্য বেসান্তকে সরকারের তরফে ২০,০০০ টাকা জামিন (security) জমা রাখতে বলা হল। জিন্না, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, সাপ্রু, ওয়াজির হোসেনকে ইংল্যান্ডে প্রতিনিধি হিসাবে পাঠানো হল সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে। বিপরীতভাবে কংগ্রেসের তরফ থেকে বিভিন্ন প্রদেশ কমিটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের প্রস্তাব নিয়ে তৎপর হল। এই পর্বে তাদের দাবি ছিল আলি ভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ আটক (অন্তরীণ) ব্যক্তিদের মুক্তি। ইতিমধ্যে গান্ধিজি ভারতে এসেছেন (১৯১৫ খ্রি.) এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনি, বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখকে নিয়ে কৃষক, কাপড়ের কলের মজুর প্রভৃতিদের আন্দোলনে যুক্ত হলেন। চম্পারণের নীল চাষিদের দাবি নিয়েও তিনি তৎপর হলেন। হোমরুল আন্দোলন নিয়ে তাঁরও

তেমন মনোযোগ ছিল না। তাঁর লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসকে একটি জাতীয় সর্বভারতীয় গণমঞ্চে পরিণত করা।[২] এদিকে ব্রিটিশ সরকার তার সংস্কার রিপোর্ট (জুলাই, ১৯১৮ খ্রি.) পেশ করেছে। আর এই সংস্কার প্রস্তাব নিয়েই একদিকে উদারবাদী সুরেন্দ্রনাথ ও চরমপন্থী বিপিনচন্দ্রের মধ্যে বিতর্ক লেগে গেল কলকাতা প্রাদেশিক সম্মেলনে। বিপিন চন্দ্র পাল ব্রিটিশ প্রস্তাবে সায় না দিলেও সুরেন্দ্রনাথ চাইলেন সংস্কারের এই প্রস্তাব গৃহীত হোক। তিলককে আবার আটক করা হল। সরকারের তরফে ভারত সুরক্ষা আইন জারি হল আরও দৃঢ়ভাবে। বল্লভভাই প্যাটেলের আহ্বানে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের তেত্রিশতম অধিবেশনে (১৯১৮ খ্রি., সভাপতি হাসান ইমাম) মন্টাগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট (Montague Chelmsford Report) সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলেছে এবং কিছু প্রশ্নে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ এই সংস্কার প্রস্তাবের পক্ষে এলেও কংগ্রেসের বামপন্থী নেতারা তিনটি প্রশ্নে দ্বিমত পোষণ করে প্রস্তাবের সংশোধন চাইলেন; দেশের মানুষের জন্য অধিকারের ঘোষণা, বাক্ ও মতামত প্রকাশ ও সংঘ গঠনের প্রশ্নে বিচার বিভাগীয় জরিমানা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা। অ্যানি বেসান্তও মন্টাগু প্রস্তাবকে মর্যাদা হানিকর মনে করলেন। গান্ধিজিও সরকারের দ্বৈত-শাসনের নীতিতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। সৈন্য কমিয়ে, করভার হ্রাস করে, দেশে শিল্পোদ্যোগকে গুরুত্ব দিয়ে সরকার তার দায়িত্ব পালন করুক, গান্ধি এটাই চাইলেন।

দিল্লিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশন (ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশনগুলিতে, প্রতিনিধি সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে—বোম্বাই কংগ্রেসে সংখ্যাটি ছিল ৩৫০০, একই বছরে দিল্লিতে বহু কৃষক প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সংখ্যাটি দাঁড়াল ৪৮৬১) বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সর্বপ্রথম দিল্লি কংগ্রেসে ইংরেজির পরিবর্তে হিন্দিতে প্রস্তাব নেওয়া হল। এই পর্বেই কুখ্যাত রাওলাট আইন (Rowlat Act) জারির প্রস্তাব এল সরকারের তরফে। মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দিল্লি অধিবেশন সমস্ত নিপীড়নমূলক আইন বন্ধের প্রস্তাব করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা হল রাওলাট আইন প্রচলিত হল এবং এর নিষ্ঠুর পরিণতি হল :

* সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ,
* বিনা বিচারে আটক ও প্রতিরোধমূলক শাস্তির ব্যবস্থা,
* সরকারি ও পুলিশি এবং সামরিক সংগঠনকে একতরফা ব্যবহার,
* পাঞ্জাবের অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড।[৩]

জালিয়ানওয়ালাবাগের বিয়োগান্ত পরিণতি এবং ব্রিটিশ শাসনের উগ্র সামরিক নীতি যে সমাধান নয় সেটা বোঝা গেল ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। বছরটি নানা কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ :

১. সরকার নিপীড়ন আইন ত্যাগ করে গ্রহণ করল সংস্কার আইন, মন্টাগু-চেমসফোর্ড আইন হল সরকার প্রবর্তিত দায়িত্বশীল শাসনের একটি ধাপ।

২. রাষ্ট্রপতি উইলসন, লয়েড জর্জ-এর আত্মনিয়ন্ত্রণের ভাবনা ভারতবাসীর মনেও সাড়া জুগিয়েছে।

৩. গান্ধিজি আবির্ভূত হলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের রঙ্গমঞ্চে প্রধান ও অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতিতে সারা বিশ্বজুড়ে যে ভাবনা প্রভাব ফেলেছে তা হল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self Determination)। ভারতের রাজনৈতিক জীবনেও বিশ্বযুদ্ধজনিত পরিবর্তনের প্রভাব পড়েছে। ভারত থেকে ব্রিটিশ সেনা সরাতে হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সমাবেশ ঘটেছে। জার্মানি ও তুরস্ক মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ শিবিরের প্রতিপক্ষ হিসেবে হাজির হয়েছে। তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে (হিন্দু ও মুসলমান শক্তির সহযোগিতা এই পর্বের এক উল্লেখযোগ্য প্রবণতা)। বাংলার বিপ্লব আবার সচল হল। সন্ত্রাসবাদের হাত শক্ত হল বাঘাযতীনের নেতৃত্বে, গদরপন্থী বিদ্রোহে। বাংলা, পাঞ্জাব বিপ্লবের শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিণত হল। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সরকার নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা তীব্র করেছে। বিদ্রোহীদের কারাদণ্ড, মৃত্যুদণ্ড, দ্বীপান্তর, অন্তরীণ রাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। নরমপন্থীরা আশা করছেন যুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করার প্রতিদানে রাজনৈতিক

সংস্কার মঞ্জুর করা হবে। তিলক, গান্ধি, বেসান্ত সকলেই আপসের রাস্তাই খুঁজেছেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে একটা
মিলেছে। হিন্দু-মুসলিম বিভেদ মেটাতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রশ্নে চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এই পর্বেই হোমরুল
দানা বেধেছে কিন্তু সাফল্য পায়নি। তবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ভারত শাসন আইনে দায়িত্বশীল শাসনের নীতিকে
করার ইচ্ছা প্রকাশ পেল ব্রিটিশ সরকারের তরফে। মন্টাগু-চেমসফোর্ড আইন হিসাবে পরিচিত শাসন সংস্কারে
দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার কিছু অগ্রগতি লক্ষ করা গেল। ভারতে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ আইনের (Devolution
মাধ্যমে সরকারি ক্ষমতাকে কেন্দ্র ও প্রদেশগুলির মধ্যে বিভক্ত করা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় আইনসভা,
আইন পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হলেও এগুলিকে কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা তেমনভাবে গৃহীত
তিলক এই আইনকে 'unsatisfactory and disappointing—a sunless dawn' বলে মন্তব্য করলেন।
জানালেন, এই আইন 'unworthy of England to offer and India to accept'।[৪] মডারেট নেতৃবর্গের
গোষ্ঠীর কাছে (সুরেন্দ্রনাথ) আইনটি গ্রহণযোগ্য মনে হলেও গান্ধিসহ অধিকাংশই একে হতাশাজনক বলেই
করেছেন। লক্ষ করা দরকার জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের রক্ত তখনও শুকয়নি এবং খিলাফৎ ও অসহযোগ
আন্দোলনের ডাক শোনা গেল। ১৯১৯-২০ খ্রিস্টাব্দ থেকেই শুরু হল জাতীয় আন্দোলনের নতুন উন্মাদনা।
নেতৃত্বে এলেন গান্ধিজি।